কুইনিন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

বিদ্যার বহু বিস্তীর্ণ ধারার সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এরকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন। শিক্ষাপদ্ধতির ত্রুটি, মানসিক সচেতনতার অভাব, বা অন্য যে-কোনো কারণেই হউক, আমরা অনেকেই স্বকীয় সংকীর্ণ শিক্ষার বাহিরের অধিকাংশ বিষয়ের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। বিশেষ, যাঁহারা কেবল বাংলা ভাষাই জানেন তাঁহাদের চিন্তানুশীলনের পথে বাধার অন্ত নাই; ইংরেজি ভাষায় অনধিকারী বলিয়া যুগশিক্ষার সহিত পরিচয়ের পথ তাঁহাদের নিকট রুদ্ধ। আর যাঁহারা ইংরেজি জানেন, স্বভাবতই তাঁহারা ইংরেজি ভাষার দ্বারস্থ হন বলিয়া বাংলা সাহিত্যও সর্বাঙ্গীণ পূর্ণতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্ব গ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

১৩৫০ সাল হইতে এযাবৎ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের মোট ৯৮ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি গ্রন্থের মূল্য আট আনা। পত্র লিখিলে পূর্ণ তালিকা প্রেরিত হইবে।

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহের পরিপূরক লোকশিক্ষা গ্রন্থমালার পূর্ণ তালিকা মলাটের তৃতীয় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরিত হইবে।

কুইনিন

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩৬০ আষাঢ়

মূল্য আট আনা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীঅজিতকুমার বসু
শক্তি প্রেস। ২৭/৩বি হরি ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা
৩·১

সূচী

ম্যালেরিয়া

আমাদের দেশে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ম্যালেরিয়া জ্বর বড় বেশি চেনা। ম্যালেরিয়ায় যত লোক এ দেশে মারা যায়, অন্য কোনো রোগে বোধ করি এত বেশি যায় না। কোথা থেকে এ রোগের সূত্রপাত হল তা জানা যায় না। এ রোগের জন্য কত দেশ যে বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে তার ঠিক নেই। বাংলার পল্লী, বড় বড় ভাঙা ভাঙা কোঠাবাড়ি-দালান নিয়ে আজও তার সাক্ষী। জানা গেছে, ইটালীতে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে ম্যালেরিয়া রোগে মড়ক হয়েছিল। এমন কি খৃস্টের মৃত্যুর পর ষষ্ঠ সপ্তম একাদশ দ্বাদশ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ইটালীতে ম্যালেরিয়ার প্রচণ্ড প্রকোপের কথা শোনা গেছে। প্রাচীন দেশের মধ্যে গ্রীস, ম্যাসিডোনিয়া, আফ্রিকা দেশেও ম্যালেরিয়া রোগ হওয়ার কথা জানা গেছে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলের সতেরটি রাজ্য আজও ম্যালেরিয়া থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। এদের জন্য আমেরিকার রাজকোষ প্রতি বছরে বিশ সহস্র কোটি টাকা খরচ করেও ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ করতে পারে নি। এ রোগ যে অনেক পুরাতন সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এই রোগে মারা যান। সম্রাট সীজার ক্ষতিগ্রস্ত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে রোমান সেনার অভিযান ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। তিন হাজার বছরের উপর হয়ে গেল, আজও ম্যালেরিয়ার উপদ্রব কমে নি।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ

গোড়ার দিকে রোগ ছিল, প্রতিকার ছিল না। ১৬৩০ সালের কথা। খৃস্টান পুরোহিতেরা এলেন এগিয়ে। পেরু দেশের লিমাতে পাদ্রীরা ম্যালেরিয়ার ওষুধ বিতরণ করতে লাগলেন। তাঁরা সিনকোনা গাছের ছাল বেটে রোগীকে সেবন করাতেন। তাতে ম্যালেরিয়া জ্বর সেরে যেত। রোম দেশের সাণ্টো স্পিরিটো (Santo Spirito) নামে হাঁসপাতালের প্রাচীর চিত্রে আঁকা রইল

ম্যালেরিয়া-প্রধান স্থান

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা

আফ্রিকা

ভারতবর্ষ ও এশিয়া ভূখণ্ডের বিভিন্ন দেশ

কার্ডিনাল জুয়ান ত্ব ল্যুগো (Cardinal Juan de Lugo) ম্যালেরিয়া রোগীদের সিনকোনা দিচ্ছেন।

দু শ বছর এই ভাবে চলল। সিনকোনার ছাল ম্যালেরিয়ার অমোঘ ওষুধ বলে পরিচিত হল। ম্যালেরিয়া জ্বর কেন হয় তখনও জানা গেল না। ভাপসা জলার আশপাশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি বলে লোকে ভাবত দূষিত বায়ুর জন্য ম্যালেরিয়া হয়। ম্যালেরিয়া কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল মন্দ বাতাস (*Mal aire*)। নাম দিয়েছিলেন একজন ইটালিয়ান, টার্টি (Terti) তাঁর নাম (১৬৫৮—১৭৪১)।

ম্যালেরিয়ার কারণ

১৮৮০ সাল, ৬ই নভেম্বর। আলজেরিয়ার কন্‌স্টান্‌টিন শহরে চার্লস্ লুই আল্‌ফন্‌স লাভেরান (Charles Louis Alphonse Laveran) অণুবীক্ষণের সাহায্যে ম্যালেরিয়া রোগীর রক্তে প্রোটোজোআন (Protozoan) আবিষ্কার করলেন। বললেন, এই প্রোটোজোআনই ম্যালেরিয়া রোগের আদিম কারণ। নাম দিলেন প্লাসমোডিঅম (Plasmodium)। লাভেরান তখন ফরাসী সেনার ডাক্তার। বয়স মাত্র পঁচিশ। তাঁর আবিষ্কার থেকে ম্যালেরিয়ার স্বরূপ জানা শুরু হল। নোবেল পুরস্কার তখন ছিল না। থাকলে লাভেরানের নিশ্চয়ই তা প্রাপ্য হত।

প্লাসমোডিঅম একজাতের এক কোষী অরগ্যানিজম্ (Organism)। এদের জীবন-ইতিহাসের এক অধ্যায়ে দেখা যায় হঠাৎ এক থেকে এরা শতধা হয়ে ওঠে। বংশ বৃদ্ধি পায় অযৌন ভাবে। ম্যালেরিয়ার সাংঘাতিক অবস্থায় লক্ষ লক্ষ প্লাসমোডিঅম-কণা রক্তস্রোতে পাওয়া যায়। এরা লাল কণিকা-গুলিকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলে। রক্তের পরিমাণ অনেক কমে গেলে রোগীর মারা যাওয়া আর বিচিত্র কি!

লাভেরানের আবিষ্কারের পর আরও অনেক জাতের প্লাসমোডিঅম আবিষ্কার হল। বিভিন্ন জাতের ম্যালেরিয়ায় বিভিন্ন জাতের প্লাসমোডিঅম ধরা পড়ল।

থিয়োফ্রেস্টাস্ (Theophrastus), গ্যালিন (Galen) প্রভৃতি প্রাচীন চিকিৎসকেরা জ্বরের বিরাম ও পুনরাগমনের দিনের হিসাব করে ম্যালেরিয়ার শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। এর অবশ্য অনেক পরে জানা গেল বিভিন্ন প্লাসমোডিঅমের উপরই ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রকোপ ও জ্বরের প্রকৃতি নির্ভর করে।

এ তো নাহয় জানা গেল। কিন্তু ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রামিত হয় কি করে, তা তো বোঝা গেল না। প্লাসমোডিঅমের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে আরও জানা গেল। এর জীবনে তিনটি বিশেষ অধ্যায়। দুটি অধ্যায় মানুষের রক্তের ভিতরে পূর্ণ হয়। আর তৃতীয়টি সম্পূর্ণ হয় এনোফিলিস (Anopheles) মশার পেটের ভিতরে। প্লাসমোডিঅমের প্রথম অবস্থার কথা জানালেন লাভেরান। তার পর যিনি ম্যালেরিয়ার অন্তর্গূঢ় কারণ উদ্‌ঘাটন করলেন তাঁর নাম আমাদের সুপরিচিত। তিনি রনাল্ড রস (Ronald Ross)। কলিকাতা শহরের প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাঁসপাতালে বসে তিনি ম্যালেরিয়া সংক্রান্ত অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। ঐ হাঁসপাতালের প্রাচীরগাত্রে তাঁর স্মৃতিফলক আজও উৎকীর্ণ আছে।

রনাল্ড রস জাতিতে বৃটিশ। জন্ম ভারতবর্ষে। ইনিই সর্বপ্রথম মশার পেটে ম্যালেরিয়ার জীবাণু দেখতে পান। ম্যালেরিয়ার রহস্য জানা গেল। অনুমান করা গেল কেমন করে মানুষ থেকে মানুষে ম্যালেরিয়া সংক্রামিত হয়। এই এনোফিলিস মশা তা হলে ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহে নিয়ে বেড়ায়। সেকেন্দ্রাবাদের বেগমপতে ১৮৯৭ সালে ২৫শে আগস্ট ম্যালেরিয়ার কারণ রনাল্ড রস প্রথম খুঁজে পান। এর কয়েক মাস পরে গিয়োভানি ব্যাটিস্টা গ্রাসী (Giovanni Battista Grassi) বলে একজন ইটালিয়ান প্রাণীতত্ত্ববিদ্ প্রমাণ করেন কেবলমাত্র এনোফিলিস স্ত্রী-মশা-ই মানুষ থেকে মানুষে প্লাসমোডিঅম সংক্রামিত করে বেড়ায়। অন্য জাতির মশা করে না।

লাভেরান, রস ও গ্রাসীর গবেষণার ফলে জানা গেল ম্যালেরিয়া কেন হয়। এবং এর থেকে আন্দাজ করা গেল কুইনিনে কেন সারে। প্লাসমোডিঅম

অন্যান্য জীবাণুর মত চায় বাঁচতে, বংশবৃদ্ধি করতে। তার জীবনচক্রে, তার আহার বাঁচা ও বৃদ্ধি, সবশেষে বংশবৃদ্ধির প্রণালীতে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি হয়।

ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবনচক্র

ধরা যাক যে এনোফিলিস স্ত্রী-মশার লালাগ্রন্থিতে এককোষী অযৌন অবস্থায় প্লাসমোডিঅম রয়েছে। মশাটি আমাকে কামড়াল। আমার রক্ত শোষণের সময় কয়েকটি এই অবস্থার প্লাসমোডিঅম আমার শরীরের রক্তে মিলিত হল। এই সময়ে ম্যালেরিয়া-নাশক ওষুধ সেবনে কোনো ফল হয় না। ওষুধের দ্বারা প্লাসমোডিঅম এই অবস্থায় নষ্ট হয় না। তাদের বাঁচা ও বৃদ্ধির হার কোনোটাই কমে যায় না। আমাদের রক্তে এই অবস্থায় নয় থেকে পনের দিন পর্যন্ত প্লাসমোডিঅম অপ্রকট থাকে। তবে এই কয়দিনে প্লাসমোডিঅমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সংখ্যাও কম নয়, লক্ষ লক্ষ। তার পর এরা নিভৃতে রক্তের লাল কণিকাগুলিকে আক্রমণ করে চলে। তখন তার ফল স্বরূপ আমাদের শরীরে জ্বর দেখা দেয়। এই হল কুইনিন-সেবন শুরু করবার উপযুক্ত সময়।

প্লাসমোডিঅম তিন ভাগে বিভক্ত হতে থাকে। পূর্বেকার মত এক ভাগ অযৌন অবস্থাতে থাকে। অপর দুটি স্ত্রী ও পুরুষ-রূপে প্রকাশ পায়। অযৌন অবস্থার প্লাসমোডিঅমের সংখ্যা প্রথমে বৃদ্ধি পায়। তার পর এইগুলি রক্তের লাল কণিকাগুলিকে আক্রমণ করে। সেই সময় জ্বর আসে। অযৌন প্লাসমোডিঅমের সংখ্যাবৃদ্ধি কোনো উপায়ে প্রতিরোধ করতে না পারলে ক্রমে এরা অস্থির মজ্জার ভিতরে ঢুকে পড়ে। আবার প্লীহাতেও আশ্রয় নেয়। শুধু বাসা বাঁধে না, লুকিয়ে থাকে। আবার লাল কণিকাগুলিকে আক্রমণ করার অবস্থা অনুকূল হলেই রক্তস্রোতে এসে মেশে। আবার জ্বর হয়। আমরা বলি ম্যালেরিয়ার পালাজ্বর আবার হল। ওষুধ সেবনে অনেক প্লাসমোডিঅম হত হয়। কিন্তু সহজে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে যায় না। অবশিষ্ট প্লাসমোডিঅম তখন আর ম্যালেরিয়া-জ্বরে প্রকট হয় না। এই অবস্থায়

এদের বলে গ্যামেটোসাইট্‌স (Gametocytes)। এরা ম্যালেরিয়া-জ্বর সারার পরও মাসাবধি রক্তস্রোতে ঘুরে বেড়ায়। তার পর ধীরে ধীরে মরে যায়। এরা প্লাসমোডিঅমের যৌনরূপ। এদের তখনও কুমার কুমারী অবস্থা। এখন আমাদের আবার মশা কামড়ালে মশার পেটে আমাদের রক্ত চলে যায়। তার সঙ্গে যায় গ্যামেটোসাইট্‌স। মশার পেটে গ্যামেটো-সাইট্‌সদের যৌনমিলনে জাইগোট (Zygote) বা প্লাসমোডিঅমের তৃতীয় অবস্থা উৎপন্ন হয়। জাইগোটগুলি মশার পাকস্থলীর দেয়ালের গায়ে আটকে থাকে। চোদ্দ দিন পরে উঁএসিস্ট (Oöcyst) জীবাণুরূপে জাইগোট বেড়ে ওঠে। সিস্ট থেকে অসংখ্য স্পোরোজোইট বেড়ে ওঠে। পাকস্থলী থেকে আশ্রয় নেয় লালাগ্রন্থি রসে। সেখান থেকে আবার মানুষকে মশা কামড়ালে রক্তে মিলিত হয়। এইভাবে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর জীবনচক্র ঘুরে চলে। বলতে গেলে বিস্ময় লাগে। জীবাণুগুলির জন্ম বৃদ্ধি ও বংশবৃদ্ধির জন্য কত দূরে দূরে থাকা জিনিসেরই না প্রয়োজন! প্লাসমোডিঅম অরগ্যানিজ্‌মের চাই মানুষের রক্ত, তার খাদ্য রূপে। চাই এনোফিলিস স্ত্রী-মশার পাকস্থলীর আশ্রয়, যৌনমিলনের জন্য। তার জীবনচক্রের ঘূর্ণনে বেরিয়ে আসে ম্যালেরিয়ার জীবাণু যার প্রকোপে কত গ্রাম নগর ধ্বংস হয়ে যায়। প্রতি বৎসর ম্যালেরিয়া-রোগীর সংখ্যাই কি কম! সারা পৃথিবীতে প্রায় আশি কোটি। বছরে ম্যালেরিয়া-রোগে মৃত্যুর সংখ্যাও অল্প নয়, প্রায় তিরিশ লক্ষ। প্লাসমোডিঅমের জাতিভেদে জীবনচক্রের প্রকৃতির সামান্য তফাত হলেও সাধারণের তা বোধগম্য নয়। তিনটি জাতির প্লাসমোডিঅম বিশেষ ক্ষতি করে; প্লাসমোডিঅম ভাইভেক্স (*Plasmodium vivax*) বিনাইন টার্সিআন (**Benign tertian**) ম্যালেরিয়া ছড়ায়। প্লাসমোডিঅম ফালসিপেরাম (*P. falciparum*) ম্যালিগনেণ্ট টার্সিআন (**Malig-nant tertian**) ম্যালেরিয়া সংক্রামিত করে, আর প্লাসমোডিঅম ম্যালেরিয়ে (*P. malariae*) কোআর্টান (Quartan) ম্যালেরিয়া আনে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে প্লাসমোডিঅমের জীবনচক্রে দুইটি বিশেষ অবস্থা—
১. মশার পাকস্থলীতে যৌনচক্র, আর ২. মানুষের দেহের রক্তে অযৌন চক্র :
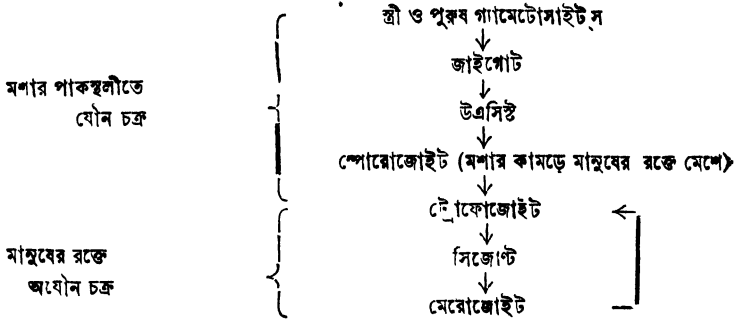
অযৌন চক্র

মশার কামড়ে কয়েকটি স্পোরোজোইট (Sporozoite) মানুষের দেহের রক্তে এসে মিশল। এরা রক্তের লাল কণিকায় প্রবেশ করল, আর ট্রোফোজোইটে (Trophozoite) পরিণত হল। এরা বৃদ্ধি পেয়ে বিভক্ত হয়ে সিজোণ্ট (Schizont) আকার গ্রহণ করে। সিজোণ্টগুলি বিদীর্ণ ক'রে মেরোজোইট বের হয়ে রক্তে মেশে। মেরোজোইট আবার লাল কণিকায় প্রবেশ ক'রে ট্রোফোজোইটে পরিণত হয়।

যৌন চক্র

কতকগুলি ট্রোফোজোইট আবার বড় হয়ে গ্যামেটোসাইট্‌স (Gametocytes) হয়। মশা কামড়ালে গ্যামেটোসাইট্‌স মশার পেটে চলে যায়। সেখানে গ্যামেটোসাইট্‌সের যৌনরূপ প্রকট হয়। স্ত্রী ও পুরুষ গ্যামেটের মিলনে জাইগোট (Zygote) উৎপন্ন হয়। তার পর এরা মশার পাকস্থলীর দেয়ালের পাতলা স্তর ভেদ ক'রে উএসিস্ট (Oocyst) রূপে বৃদ্ধি পায়। সিস্ট থেকে অসংখ্য স্পোরোজোইট বেড়ে ওঠে। তার পর শতধা হ'য়ে মশার লালাগ্রন্থি-রসে গিয়ে মেশে। মশা কামড়ালে মানুষের রক্তে স্পোরোজোইট মিশে যায়।
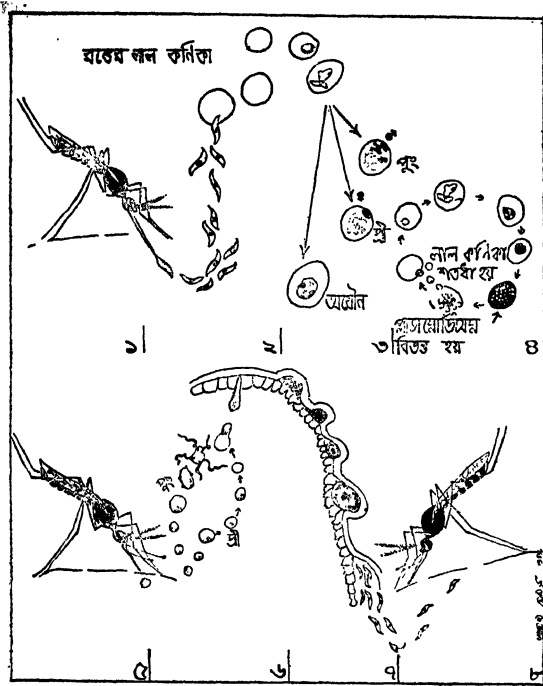
ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জীবনচক্র

১. মানুষকে মশা কামড়াল। মশার লালাগ্রন্থিতে প্লাসমোডিঅম রয়েছে। ২. কয়েকটি ম্যালেরিয়ার জীবাণু রক্তে মিলিত হল। ৩. জীবাণুগুলির স্ত্রী, পুরুষ ও অযৌন অবস্থা প্রকট হল। ৪. অযৌন জীবাণু বৃদ্ধি পেয়ে রক্ত-কণিকাগুলিকে শতধা করে ফেলল; ম্যালেরিয়া-জ্বর দেখা দিল। ৫. আবার মশা কামড়াল: রক্ত থেকে স্ত্রী ও পুরুষ জীবাণু মশার পেটে আশ্রয় নিল। ৬. 'জাইগোট' উৎপন্ন হল। মশার পাকস্থলীর দেয়ালের গায় আটকে থাকল। ৭. চোদ্দ দিন মশার পেটে জীবাণুগুলি বাড়ল, আবার প্লাসমোডিঅমের অযৌন রূপ মশার লালাগ্রন্থিতে উপস্থিত হল। ৮. মশা কামড়ালে জীবনচক্রের আবার আবর্তন চলল।

ম্যালেরিয়া-নিবারণ

কোনো কোনো জায়গায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ লাঘব করতে পারলেও সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে ফেলা আজও সম্ভব হয় নি। ম্যালেরিয়া দূর করতে হলে এনোফিলিস মশার জাতি নির্বংশ করতে হবে। এ ছাড়া আর কোনো ভাল উপায় এখনও জানা যায় নি। এ কিন্তু আজও সফল হয় নি। মশা যাতে না জন্মাতে পারে তাই খানা-ডোবা বুজিয়ে ফেলা হয়। আর মশার কীট মেরে ফেলবার ব্যবস্থা করা হয়। যেসব মাছ মশার কীট খেয়ে ফেলে পুকুরে তাদের চাষ করা হয়। মৌরলা খলিসা তেচোকে প্রভৃতি মাছ মশার কীট খেয়ে ফেলে, তাই সে সব মাছ জন্মানো হয়। মাছ চাষ করাও হয়; ঝাঁকে ঝাঁকে মশার কীট তাদের পেটে যায়; সবই সত্য, কিন্তু একেবারে সব-ক'টি কীটই মরে যায় না। কতকগুলি বাঁচে, বড় হয়ে মশায় পরিণত হয়। তাদের বাঁচা আর বড় হওয়ার সম্ভাবনা সব সময়ে সব স্থানে রয়ে গেছে। হয়ও তাই। মশার উপদ্রব লাঘব হয় বটে, নির্মূল হয় না। মশার বাসস্থান, জন্মস্থান, সব ঝোপ-ঝাড় জলা জায়গায় এক সময় কেরোসিন ছড়ানো হত। তাতে মশার ডিম মরে যেত। তাতেও মশা কমত বটে, কিন্তু একেবারে উচ্ছেদ হত না। আজকাল 'ডি ডি টি' কীটনাশক চূর্ণ কেরোসিন তেলে গুলে মশাপ্রধান জায়গায়, ঝোপে-ঝাড়ে, কোণে-বনে ধারাস্নান করানো হয়। তাতে মশার উৎপাত সাময়িক ভাবে কমে। আমেরিকার রকিফেলার ফাউণ্ডেশ্যন আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যবিভাগ খুলেছেন। তার একটা বড় কাজ হচ্ছে ম্যালেরিয়া ধ্বংস করা। এনোফিলিস-মশার জীবনবিজ্ঞান তাঁরা ভালো করে জানলেন। মশার কীট-অবস্থায় ধ্বংস করে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। আফ্রিকায় এক জাতীয় এনোফিলিস-মশা আছে, এর নাম এনোফিলিস গ্যাম্বিয়ে (***Anopheles gambiae***)। অত্যন্ত সাংঘাতিক জাতের ম্যালেরিয়ার জীবাণু এরা বহন করে। ব্রাজিল দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এই জাতীয় মশা জন্মায়। রকিফেলার ফাউণ্ডেশ্যন এদের প্রায় নির্বংশ করে ফেলেন। এতে তাঁদের বিশ লক্ষ ডলার ব্যয় হল। দুই হাজারের উপর শিক্ষিত কর্মী উঠে-পড়ে কাজ করলেন। তাঁরা বারো হাজার বর্গ মাইল

জায়গা জুড়ে ম্যালেরিয়ার মশার উচ্ছেদ করতে প্রবৃত্ত হলেন। এ হল ১৯৪৩ সালের কথা। দুই বছরের ভিতর আবার এনোফিলিস গ্যাম্বিয়ে দেখা দিল নাটালে আর ব্রাজিলে।

সম্প্রতি ওআর্লড্ হেল্‌থ অরগ্যানিজেশন (World Health Organization) থাইল্যাণ্ডে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ অভিযান চালিয়েছেন। 'ডি ডি টি'র ধারাস্নানে সেখানকার মশা, এনোফিলিস মিনিমাম (*Anopheles minimum*) ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। এই মশাগুলি ঘরের দেয়ালে দিনের বেলায় বসে থাকে। আর রাত্রে কামড়ায়। দেয়ালের ভিত্তির আট ফুট উচু পর্যন্ত বসে, তার চেয়ে উঁচুতে বসে না। দেয়ালে 'ডি ডি টি'র ধারা দেওয়া থাকলে মশারা বসলে পরে, ধীরে ধীরে ডি ডি টির বিষাক্ত প্রভাবে মরে যায়। আমাদের দেশেও এঁরা কাজে নেমেছেন। গত দুবছর ধরে মালনাদ (মহীশূর), তরাই (উত্তরপ্রদেশ), উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চল, আর মাদ্রাজের এরনাদ অঞ্চলে এঁরা অভিযান চালিয়েছেন। সুফল দেখা যাবে সন্দেহ নেই।

আর-এক উপায়ে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ করা যায়; মানুষের শরীরে ম্যালেরিয়ার বীজ ধ্বংস করে ফেলে। একমাত্র ওষুধ-সেবনে তা সম্ভব হয়। তাই কুইনিন সেবন করানো হয়। ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত স্থানে বাস করতে হলে প্রতিষেধক হিসাবে স্বল্প-পরিমাণ কুইনিন সেবন করার ব্যবস্থা হয়।

এদেশে ম্যালেরিয়া-নিবারণ প্রচেষ্টা

আমাদের এই পশ্চিম-বাংলায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছু কম নয়। ১৯৪৬ সালের লোক-গণনায় প্রকাশ হল, সে বছর এই পশ্চিম-বাংলায় লোকসংখ্যা ছিল ২১,১৬৬,৮৫২। তার মধ্যে কেবলমাত্র ম্যালেরিয়ায় মারা গেল ১০৩,৩৩৯ জন। হিসাবে দাঁড়াল শতকরা পঁচিশটি মৃত্যুসংখ্যার কারণ হল ম্যালেরিয়া-রোগ। আর তার পরের বছর ১৯৪৭ সালে লোকসংখ্যা ছিল ২১,২৩৫,০৮০। তার মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মরল ৮২,৫৩৯ জন। পশ্চিম-বাংলা সরকারের জনস্বাস্থ্য-রিপোর্ট থেকে জানা যায়, শহর অপেক্ষা গ্রাম অঞ্চলে ম্যালেরিয়ায় লোক বেশি মরে। কলকাতাতে ম্যালেরিয়া সবচেয়ে কম।

নদীয়া আর বীরভূম জেলায় খুব বেশি। শরৎকালের শেষ থেকে শীতকাল পর্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি থাকে।

পশ্চিম-বাংলা সরকার ম্যালেরিয়া নিবারণের প্রচেষ্টা প্রতি বছরই কিছু কিছু করে থাকেন। যেসব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি, সেখানকার মিউনিসিপ্যালিটি বা জেলাবোর্ডে ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধের জন্য অর্থসাহায্য করেন। কয়েক বছর আগে শ্রীরামপুর ভাটপাড়া শান্তিপুর গোবরডাঙা চাকদা রানিগঞ্জ কৃষ্ণনগর বর্ধমান সিঙুর বজবজ ও পূর্ব-কলিকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানগুলি সরকার থেকে অর্থসাহায্য পান। শুধু তাই নয়, সরকার বিভিন্ন হাঁসপাতালে ও ম্যালেরিয়া-চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে কুইনিন বিতরণের ব্যবস্থা করেন। যে পরিমাণ কুইনিন আমাদের প্রয়োজন, সে পরিমাণ আমাদের দেশে তৈরি হয় না বলে, আর জাভা থেকেও কুইনিন আসা যুদ্ধের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ভারত সরকার বিদেশ থেকে নিজ খরচে ম্যালেরিয়া-নাশক ওষুধ কিনে বিভিন্ন প্রদেশে বিতরণ করেন। ১৯৪৬ সালে ভারত সরকার ম্যালেরিয়া-নাশক ওষুধ কেনবার জন্য পশ্চিম-বাংলা সরকারকে কুড়ি লক্ষ টাকা দেন।—

১৯৪৬	কুইনিন উপক্ষার	৬০,০০০ পাউণ্ড
	জ্বরঘ্ন সিনকোনা উপক্ষার	৪০,০০০ পাউণ্ড
	মেপাক্রিন	১৪৪,৬০০,০০০ বড়ি
১৯৪৭	কুইনিন উপক্ষার	৬,৯৮৪ পাউণ্ড
	জ্বরঘ্ন সিনকোনা উপক্ষার	৭,১০৬ পাউণ্ড
	মেপাক্রিন ও পালুড্রিন	৬,৮২৫ পাউণ্ড

১৯৪৪ সালে কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার মহামারী শুরু হয়। তখন থেকে সে অঞ্চলে ম্যালেরিয়া দূর করার চেষ্টা চলে। ১৯৪৫ সালের শেষ ভাগ থেকে ঐসব অঞ্চলে ডিডিটি-চূর্ণ কেরোসিন তেলে গুলে ছড়ানো হল। তাতে স্বল্প সময়ে সুফল পাওয়া গেল। ডোবার জলে ডিডিটি'-দ্রবিত কেরোসিন তেল মাত্র কুড়ি ফোঁটা ছড়িয়ে দিলে জলের বুকে প্রায় ৪০ বর্গ ফুট জায়গা জুড়ে একটা পাতলা চাদরের মত ছড়িয়ে পড়ে, তাতে শতকরা ৯৫ ভাগ মশার বীজ

একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। জলের উপর পানা থাকলেও ডিডিটি মশার বীজ নষ্ট করে। পানা তুলে ফেলে তার পর ডিডিটি ছড়াবার দরকার হয় না। দেয়ালের গায়ে ডিডিটি-দ্রবিত কেরোসিন ছড়িয়ে দিলেও মশা মরে যায়। সিঙুরে বছর খানেক পরীক্ষা করা হয়েছে। দেখা গেছে, পুকুরে ডিডিটি ছড়ালে মাছের চাষের একটুও ক্ষতি হয় না।

পশ্চিমবাংলার ম্যালেরিয়া-পীড়িত জেলা

আসাম-রেল-লিঙ্ক প্রতিষ্ঠার সময় শ্রমিকদের ম্যালেরিয়ার জন্য যথেষ্ট অসুবিধা ঘটছিল। তখন ডিডিটি ছড়িয়ে ম্যালেরিয়া ধ্বংস করে কাজে অগ্রসর হওয়া গেল। বাংলা দেশে অনেক ম্যালেরিয়াপূর্ণ স্থানে বিমান-বন্দর আছে, যেমন শিলিগুড়ির কাছাকাছি বাঘডোগরাতে। এখানেও ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ভারত সরকার বিশেষ সতর্ক থাকেন। দমদম মাদ্রাজ কোচিন দিল্লী আগ্রা পুণা ও বিশাখাপত্তনম প্রভৃতির বিমান-বন্দরগুলির জন্য ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হয়ে থাকেন, যদি আফ্রিকার ম্যালেরিয়াপ্রধান অঞ্চল থেকে ম্যালেরিয়াবাহী মশা বিমানযোগে ভারতবর্ষে এসে উপস্থিত হয়, আর এখানে বসবাস করতে আরম্ভ করে! দু শ বছর আগে যখন নৌকাযোগে পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে আসতে আরম্ভ করে তখন এদেশে এসে জুটল তাদের সঙ্গে সিফিলিস-রোগ। প্রাচীন আয়ুর্বেদে এ রোগের উল্লেখ নাই। পরবর্তী কালের সংগ্রহ-কারকেরা সিফিলিসকে ফেরঙ্গরোগ বলে চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ করে গেছেন।

যানবাহনের গতির উন্নতির সঙ্গে বিদেশ স্বদেশের নিকটবর্তী হয়েছে, শিল্প-বাণিজ্য চিন্তাধারার আদানপ্রদানের যথেষ্ট সুবিধা সুযোগ ঘটেছে, আর তার সঙ্গে নানা জাতের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ারও সম্ভাবনা এসে গেছে। তাই জনস্বাস্থ্য কল্যাণকামীদের সতর্কতা অবলম্বনের এত প্রচেষ্টা। দিল্লীতে আছে ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীর শহর ও শহরতলী অঞ্চলে ম্যালেরিয়ানিয়ন্ত্রণ-পরিকল্পনায় প্রবৃত্ত। ১৯৪৬ সাল থেকে অবিরত চেষ্টার ফলে দিল্লীর শহরতলীতে ম্যালেরিয়ার হার শতকরা ৮০ ভাগ কম হয়েছে। স্থানে স্থানে মশা নির্বংশ হয়ে গেছে। গত বছর দিল্লী শহর অঞ্চলে এক হাজারে মাত্র দু-জন ম্যালেরিয়া-আক্রান্ত হয়েছে, অথচ দশ বছর আগে সে জায়গায় হাজার জনের মধ্যে বাহাত্তর জন ম্যালেরিয়া রোগাক্রান্ত হত।

বোম্বাইয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ-চেষ্টা চলেছে। গত বছর বোম্বাই সরকার এর জন্য ২৬ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন। এঁদের ইচ্ছা আছে আরও ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করার। মাদ্রাজে ও মহীশূরে ছোট আকারে ম্যালেরিয়া নিবারণ চেষ্টা চলেছে।

উত্তরপ্রদেশে চার হাজার মাইল লম্বা সর্দা খাল সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী হবার ফলে দুই শত বিঘা জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে জল-প্রবাহে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে জল চলার ফলে জলা জায়গার বা বদ্ধ জলকুণ্ডের অভাব ঘটেছে। মশা আর বংশবৃদ্ধির অনুকূল স্থান পাচ্ছে না। মশার উপদ্রব অনেক কমে গেছে।

কুর্গ ছিল ম্যালেরিয়ার কুণ্ড। এখন কিন্তু কুর্গেও ম্যালেরিয়া অনেক কমে গেছে।

হ্যাগিস লিখলেন, "১৪ই জানুয়ারী ১৬৪১ সালে কার্থেজিনা শহরে বিশেষ ধার্মিকা কাউন্টেস অব্ সিনকন, ডনা ফ্রান্সিস্কা হাঁরিকে দ্য রিবেরা পরলোক গমন করেছেন।"[১] উদ্ধৃত অংশটি স্মরণ রাখবার মত। বরাবর আমরা শুনে আসছি স্প্যানিশ ভাইসরয়ের স্ত্রী কাউন্টেস অব সিনকনের (১৬৩০) ম্যালেরিয়া জ্বর হয়েছিল। আর লিমা দেশের 'কিনা' (Quina) গাছের ছাল-সিদ্ধ সেবন করে তাঁর জ্বর সেরেছিল। কাউন্টেস আরোগ্যলাভ করে ম্যালেরিয়ার যম এই অমোঘ ওষুধ সাধারণ্যে প্রচার করেন। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিৎ লিনিয়স সাহেব পর্যন্ত এ কথা বিশ্বাস করেন এবং সিনকনের গৌরবে গাছটির গোষ্ঠীর নাম দেন সিনকোনা। এখানে একটা কথা আছে। সিনকোনা শব্দটির বিশুদ্ধ বানান হল c-h-i-n-c-h-o-n-a ; লিনিয়স ভাগ্যবশে অশুদ্ধ লিখে ফেলেন, c-i-n-c-h-o-n-a ; প্রথম দেওয়া নাম হিসাবে, উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী লিনিয়সের প্রথম লেখা বানানই চলিত হল।

হ্যাগিসের আবিষ্কারের ফলে জানা গেল কাউন্টেসের কোনোদিন ম্যালেরিয়া হয় নি। বরং কাউন্টের মাঝে মাঝে হত। কাউন্টেস এ গাছের ছাল ইউরোপে নিয়ে আসেন নি। তিনি দেশে ফেরার পথে মারা যান। লিমার আর্কাইভ অব্ ফ্রান্সিকান ফ্রাইআর্স (Archives of Franciscan Friars) থেকে হ্যাগিস উক্ত অংশটি উদ্ধার করেছেন। তখন কিন্তু লিমাতে কেউ এ ছালের ব্যবহার জানত না। ১৫৩৭ সালে পিজারো পেরু জয় করেন। তখনকার ইতিহাসে 'কিনা' গাছের ছালের ব্যবহারের কোনো উল্লেখ নাই। শোনা যায়, ১৬৩০ সালে লিমার ক্যাথলিক পাদ্রীরা সবপ্রথম সিনকোনা ছালের ব্যবহার শুরু করেন। ১৬৪৩ সালে প্রকাশিত একটি ফরাসী বইয়ে (*Discours et*

১ A. W. Haggis, *Fundamental Errors in the Early History of Cinchona*, The Bulletin of the History of Medicine, 1941. vol. 10, page 417.

Advis sur les Flus de Ventre Doloureux) সিনকোনার ছালের ব্যবহারের কথা গ্রন্থকার উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকারের নাম হার্মান ভ্যান দের হেডেন। এইটি ভেষজ হিসাবে সিনকোনার সবপ্রথম উল্লেখ বলে মনে হয়। ১৬৭৭ সালে সিনকোনার ছাল জ্বরঘ্ন বলে বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ায় স্থান পায়।

সিনকোনা চাষের উদ্যোগ

সিনকোনার ছালে ম্যালেরিয়া সারে জানা গেলে দক্ষিণ-আমেরিকায় সিনকোনার আদিম বাসস্থানে বৃক্ষমেধ-যজ্ঞ শুরু হল। বৃটিশ ও ওলন্দাজ ব্যবসায়ীরা নৌকা ভর্তি করে সিনকোনার ছাল আমদানি করতে লেগে গেল। সিনকোনার দুর্ভেদ্য জঙ্গলে সূর্যকিরণ হেসে বেড়াতে লাগল। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা প্রমাদ গণলেন। পরামর্শ করলেন সিনকোনার চাষ শুরু করা যাক। ১৮২০ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত সিনকোনার ভেষজগুণ কেন হয় তা কেউ বলতে পারত না। তার পর ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে পেলেটিএ (Pelletier) আর কাভেন্টু (Caventou) প্যারিসের এক রসায়নাগারে সিনকোনা-গাছের ছাল থেকে কুইনিন উপক্ষার আবিষ্কার করে ফেললেন। তখন সিনকোনার চাষ করার কথাটা আবার একটু জোরালো হয়ে উঠল। ১৮৪৮ সালে ওএডেল (Weddel) বলিভিয়া থেকে প্যারিসে সিনকোনা ক্যালিসাআর (*C. calisaya*) বীজ আনালেন। প্যারিসের ভেষজ উদ্যানে (Jardin des Plantes) তার থেকে গাছ করার চেষ্টা চলল। আর কিছু বীজ গেল লণ্ডনে (Horticultural Society of London)। ফ্রান্স থেকে সিনকোনার চারা আলজিঅর ও জাভায় প্রেরিত হল। বলতে গেলে সিনকোনার প্রথম প্রচার শুরু হল জাভায়।

ওলন্দাজ ও বৃটিশ রাজত্বে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশি। এদের মাথাব্যথা হল বেশি। উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা বললেন চাষ শুরু করা যাক। রাজ সরকার সে কথায় কান দিলেন না। আর্থিক লাভ হবে কি? বিজ্ঞানী বললেন, জনকল্যাণ অবশ্যই হবে। কুইনিন নিষ্কাশন করে ওষুধ তৈরি করলে ম্যালেরিয়া সারানো যাবে। রয়েল (Royle) ছিলেন সাহারানপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনের

অধ্যক্ষ। ১৮৩৫ সালে তিনি বৃটিশ-রাজকে খাসিয়া ও নীলগিরিতে সিনকোনা চাষ করার কথা বলেন। বারো বছর পরে আবার এই কথা মনে করান। শিবপুর বাগানের অধ্যক্ষ ফকনারও (Falconer) ১৮৫০ সালে আবার ১৮৫২ সালে বৃটিশ-রাজকে এই কথা নিবেদন করেন।

ওলন্দাজের অভিযান

৪ঠা ডিসেম্বর, ১৮৫২ সাল। বিটেনজর্গ (Buitenzorg) বটানিক্যাল গার্ডেনের উদ্যোগে হাসকার্ল (Hasskarl) হেগ থেকে রওনা হলেন দক্ষিণ-আমেরিকা, সিনকোনার বীজ ও চারা সংগ্রহ করতে। তিনি পেরু ও বলিভিয়ার পার্বত্য অঞ্চল থেকে অনেক জাতের সিনকোনার বীজ সংগ্রহ করে জাভায় পাঠালেন। দক্ষিণ-আমেরিকার লোকেরা এই ভাবে বীজ আর চারা নিয়ে যাওয়া পছন্দ করল না। হাসকার্লকে সিনকোনা সংগ্রহ করতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হল। ১৮৫৪ সালের আগস্ট মাসে সঙ্গে নিয়ে ফিরলেন সিনকোনা ক্যালিসাআর (*C. calisaya*) পাঁচ শ চারা আর অনেক বীজ। হাসকার্লের সিনকোনার চারা বাঁচানো বা বাড়ানো সম্বন্ধে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। ১৩ই ডিসেম্বর যখন ব্যাটাভিয়া এসে পৌঁছলেন তখন মাত্র পঁচাত্তরটি চারা বেঁচে আছে। সেগুলি রোপণ করে বাঁচাবার চেষ্টা হল, কিন্তু একটিও বাঁচল না।
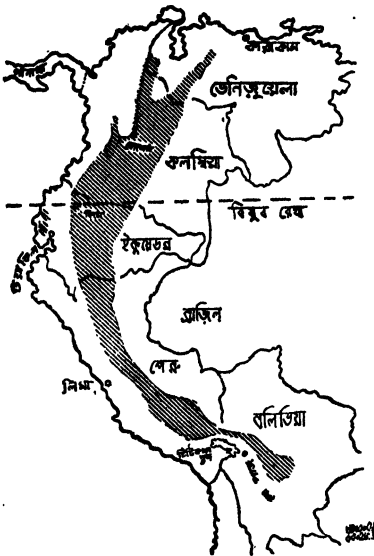
চিহ্নিত অংশ সিনকোনার আদিম বাসস্থান

বলিভিয়ার লাপাজ শহরে তখন সুক্রাফ্‌ট (Schuhkraft) হল্যাণ্ডের

কনসাল জেনারেল। তিনি বছরের পর বছর জাভায় সিনকোনার বীজ সংগ্রহ করে পাঠাতে থাকেন। চাষের চেষ্টাও চলে। ভালো চাষ কিছুতেই করা যায় না। ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৪, দীর্ঘ এগার বছরের চেষ্টায় হাসকার্ল বীজ থেকে সিনকোনার চারা জন্মাতে পারলেন। বলিভিয়া থেকে আনা সিনকোনা ক্যালিসাআর বীজ থেকে জন্মানো গাছের ছালে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুইনিন পাওয়া গেল। ১৮৬৩ সালে জাভায় সিনকোনা চাষের অবস্থাটা দাঁড়াল এই রকম—

উপ্ত হল না এমন বীজের সংখ্যা	২০৮,৩২২
চারাগাছ	৬১২,৭৭০
বড় গাছ	৫৩৯,০৪০

ওলন্দাজ সরকারের মুখ চুন। ব্যয় তো কম হল না। লোকে বলবে কি? এদিকে কফি চা আর চিনির জন্য আখের চাষে যথেষ্ট লাভ হয়। সেদিকে নজর বেশি না দিয়ে কেবল ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে যে!

বৃটিশের অভিযান

১৮৫৮ সাল। বৃটিশরাজ সচেতন হলেন। কে জানে, যদি জাভা এগিয়ে যায়। মার্খামকে (Markham) দক্ষিণ আমেরিকায় পাঠাবার ব্যবস্থা হল। অন্তরায় হল মার্খাম উদ্ভিদতত্ত্ব জানেন না। তবে প্রত্নতত্ত্ব আর ভূগোল জানেন। তার চেয়ে যেটা বেশি দরকারী, মার্খাম দক্ষিণ-আমেরিকার অনেক জায়গা চেনেন। বড় কথা হল, তিনি স্প্যানিশ ভাষা জানেন। শুধু তাই নয়, যেসব অঞ্চলে সিনকোনা জন্মায় সেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা জানেন। ১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাস। মার্খাম সদলবলে যাত্রা করলেন। সঙ্গে নিলেন গাছ-পালার কাজ জানা অভিজ্ঞ লোক। মার্খাম নিজে গেলেন বলিভিয়া অঞ্চলে। ইকুয়েডর অঞ্চলে পাঠালেন ডক্টর স্প্রুসকে। পেরুভিয়ার দিকে গেলেন প্রিচেট। অ্যাণ্ডিজের (Andes) তাম্বোপোতা (Tambopota) উপত্যকা থেকে সিনকোনা ক্যালিসাআর পাঁচ শ চারা জোগাড় হল। অত্যন্ত স্যাঁতা জায়গা,

বছরে পাঁচ মাস প্রচুর বর্ষা সেখানে। সিনকোনা সাকিরুব্রার (*C. succirubra*) বীজ সংগ্রহ হল রেড বার্ক ফরেস্ট (Red Bark Forest) থেকে। ভারতবর্ষে ডাকযোগে বীজ এল। ১৮৬১ সালে নীলগিরিতে সিনকোনা চাষের আয়োজন হল। ওলন্দাজ সরকারের সঙ্গে মিতালি করে মাদ্রাজ ও জাভার বাগানের সহযোগিতায় সিনকোনার চাষ উন্নত হল। চারাগাছগুলি বড় হল, ডালপালা গজাল। কিন্তু কুইনিনের পরিমাণ বড় কম দেখা গেল। বাগানের সবুজ শোভা হলেই ত হবে না, জ্বর সারে কই ?

লেজের প্রেরিত বীজ

তখন চার্লস্ লেজের (Charles Ledger) নামে একজন ইংরেজ সিনকোনা-ব্যবসায়ী পেরুতে থাকতেন। তাঁর বাড়ি ছিল টিটিকাকা হ্রদের তীরে পুনোতে। এইসব অঞ্চলে ভালো জাতের সিনকোনা জন্মায়, তার ছালে কুইনিনের পরিমাণ বেশি। লেজেরের একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী অ্যামাজোন অঞ্চল থেকে চোদ্দ পাউণ্ড বীজ সংগ্রহ করেন। লেজের লণ্ডনে তাঁর ভাই জনকে সেগুলি পাঠান। বলে পাঠান যেন সে বীজ বৃটিশ সরকারকে দেওয়া হয় ভারতবর্ষে চাষ করার জন্য। বৃটিশরাজ তা নিলেন না। তখন হল মুশকিল। বীজ তো চিরকাল ভালো থাকবে না। কাজেই জন ওলন্দাজ সরকারকে খবর দিলেন। জাভায় যদি চাষ করা হয়! জাভা সরকার এক পাউণ্ড বীজ কিনলেন এক শ ফ্রাঙ্ক দিয়ে। বাকী তের পাউণ্ড বীজ লণ্ডন শহরে জন ফেরি করে বেড়ালেন। ক্রেতা জুটল না। তার পর একজন সিনকোনা-চাষী কিনলেন, এবং ভারতবর্ষে ফিরে এসে বুদ্ধি করে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সিনকোনা প্লান্টেশনের (British India Cinchona Plantation) মারফত ঐ বীজের পরিবর্তে জাভা থেকে সিনকোনা সাকিরুব্রার বীজ আনালেন।

১৮৬৫ সালের ডিসেম্বর মাস। জাভার চাষে দেখা গেল, লেজেরের পাঠানো বীজ থেকে সবচেয়ে ভালো জাতের সিনকোনা-গাছ উৎপন্ন হল। ১৮৭২ সালে মোএন্স (Moens) বলে একজন রসায়নবিদ্ জাভায় এলেন, কোন্ সিনকোনা

গাছের ছালে কি পরিমাণ কুইনিন আছে পরীক্ষা করে দেখবার জন্ত। দেখা গেল, লেজেরের পাঠানো বীজ থেকে করা গাছের ছাল থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুইনিন পাওয়া গেল।

সিনকোনা লেজেরিআনার (*C. Ledgeriana*) উপর মোএন্সের গবেষণা

সাল	পরীক্ষিত গাছের সংখ্যা	কুইনিন সলফেটের পরিমাণ %
১৮৭২	৭	৮·১৫
১৮৭৩	২০	১০· ৯
১৮৭৪	২৯	১১·৬৮
১৮৭৫	১৪	১০·৭২
১৮৭৬	৫২	১৩·২৫
১৮৭৭	১৯	১২·৩১
১৮৭৮	৫৪	১০·৬৭

বেশি পরিমাণ কুইনিন প্রসবিনী এই গাছের সন্ধান পাবার আগে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুইনিন পাওয়া গিয়েছিল শতকরা তিন ভাগ। ১৮৭৮ সালের এই আবিষ্কার আজও অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। লেজেরের গৌরবার্থে লেজেরের পাঠানো বীজ থেকে করা গাছের নাম দেওয়া হল সিনকোনা লেজেরিআনা। এই আকস্মিক, অতি আবশ্যকীয় আবিষ্কারের মুখপাত্র হিসাবে ওলন্দাজ সরকার চার্লস্ লেজেরকে বহু পুরস্কারে তুষ্ট করেন। প্রথমে দেন এক শ ফ্রাঙ্ক। তার পর ভালো জাতের বীজ আন্দাজ করে চব্বিশ পাউণ্ড। পনের বছর পরে ১৮৮০ সালে যখন আর সংশয় রইল না যে একমাত্র লেজেরের পাঠানো বীজ থেকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুইনিন-যুক্ত সিনকোনা গাছ উৎপন্ন হয়েছে, তখন দেন বারো শ' গিলডার। আর ১৮৯৫ সালে লেজের ব্যবসায় থেকে অবসর নিলে মাসিক বৃত্তি ব্যবস্থা করেন এক শ গিলডার।

ভ্যান গর্কম (Van Gorkom) তখন সিনকোনা-বাগানের কর্তা। তিনি মহাসমস্যায় পড়লেন। তাঁর আমলে, আর পূর্বেও হাসকার্ল ও ইউঙ্হুনের

(Junghuhn) আমল থেকে বিবিধ জাতির সিনকোনা-গাছের চাষ করা হয়েছে। তাদের সংখ্যা তো কম নয়—

C. calisaya	প্রায় ১,২০০,০০০
C. succirubra	১৮০, ০০০
C. officinalis	২৫০,০০০
C. lancifolia	২৫,০০০
C. micrantha	১,০০০

এসব গাছের চারা করা, রোপণ করা, রক্ষা করার জন্য ব্যয়ও তো কম হয় নি। এখন কি করা যায়। যেসব জাতির সিনকোনা-গাছে কুইনিনের পরিমাণ কম তাদের জায়গা জুড়ে থাকতে দিয়ে কি হবে। বরং তাদের পরিবর্তে সেই জায়গায় সিনকোনা লেজেরিআনার চাষ করা ভালো। এইসব স্বল্প পরিমাণ কুইনিনযুক্ত গাছের ফুলের সঙ্গে *C. Ledgeriana*-র ফুলের মাখামাখি হলেও ভবিষ্যতে *C. Ledgeriana*-র বীজ আর ভালো না থাকতে পারে। এবং কয়েক বছর পরে হয় তো *C. Ledgeriana*-য় কুইনিনের পরিমাণ কমে যেতে পারে। গর্কম তাই যেসব *C. Ledgeriana*র চারায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণ কুইনিন আছে, সেগুলিকে বেছে নিয়ে একেবারে স্বতন্ত্র জায়গায় রোপণ করলেন। সতর্ক হলেন কিছুতেই যেন অন্য জাতির সিনকোনা গাছের ফুলের রেণুর সংস্পর্শে এইসব লেজেরিআনার ফুল না আসে। যত সব অবাঞ্ছিত-জাতির সিনকোনা গাছের ফুল ভালো করে ফুটতে না ফুটতেই মুকুলেই চয়ন করে ফেলে দেবার বন্দোবস্ত করলেন।

মোএন্স পরীক্ষা ক'রে বললেন *C. Ledgeriana*-য় কুইনিনের পরিমাণ বেশি হলেও অন্যান্য উপক্ষারগুলি কুইনিডিন, সিনকোনিন আর সিনকোনিডিনের পরিমাণ কিন্তু কম। এই উপাদানগুলিও জ্বরঘ্ন ভেষজ হিসাবে কাজে লাগে। দেখা গেল *C. succirubra*তে কুইনিনের পরিমাণ কম হলেও কুইনিডিন ইত্যাদির পরিমাণ বেশি।

১৮৭৫ সাল। *C. Ledgeriana* সম্বন্ধে নানা অনুসন্ধান চলল।

কি রকম মাটিতে আর কি রকম আবহাওয়ায় এই গাছ সহজে জন্মাবে তা নির্ধারিত হল। পুষ্ট ছাল আহরণ করতে হলে গাছগুলিকে কত বড় করতে হবে, কত বছর অপেক্ষা করতে হবে তাও হিসাব করা হল। চোদ্দ বছরে *C. Ledgeriana*র গাছ প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু হয়। তার গুঁড়ি তখন আট ইঞ্চি মোটা হয়। আর পঁয়তাল্লিশ বছর পরে প্রায় ৭৫।৮০ ফুট উঁচু হয়, গুঁড়ি ষোল ইঞ্চি মোটা। সবচেয়ে ভালো বাড়ে তিন হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের হার ১২৫ ইঞ্চি। বৃষ্টির হার ৯০ ইঞ্চির কম হলে আর ভালো বাড়ে না। সারা বছর ধরে বৃষ্টি হলেই সবচেয়ে ভালো। তিরিশ দিনের বেশি একাদিক্রমে শুকনো দিন সিনকোনার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। দৈনিক তাপের মাত্রা ৫৩° থেকে ৮৬° হলে ভালো।

এদেশে সিনকোনা চাষ

চাষ করতে গিয়ে দেখা গেল, *C. Ledgeriana*-কে বাঁচানো ও বাড়ানো বড় শক্ত। কিন্তু *C. succirubra* সহজে বাঁচে আর বাড়ে। তখন *C. succirubra*-র গাছে *C. Ledgeriana*-র 'কলম' করা শুরু হল। তাতে শঙ্কা হল *C. Ledgeriana*-র কুইনিনের পরিমাণ কমে যাবে না তো? আবার শুরু হল রাসায়নিক পরীক্ষা। ১৯১৯ সালে এর যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল। না, পরিমাণ তেমন কমে না।
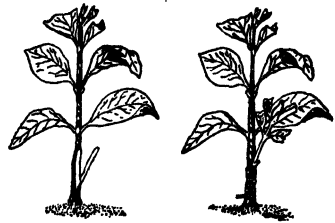
সিনকোনা গাছের কলম করা

জাভায় পরীক্ষালব্ধ ফলের উপর ভাগ বসাতে লাগলেন ভারত সরকারের চাষীরা। জাভার পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে চাষ চলতে লাগল মংপু আর নীলগিরিতে। ১৮৬১ সালে অ্যাণ্ডারসন ছিলেন শিবপুর বাগানের কর্তা। তিনি বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ স্যর জোসেফ হুকারের কাছ থেকে কিছু সিনকোনার বীজ পান। গোটা-তিরিশ চারাও তৈরি করেন। বৃটিশ

সরকার তাঁকে জাভায় পাঠান সিনকোনার চাষ শিখতে। চার শ সিনকোনার চারা আর কিছু বীজ নিয়ে তিনি ফিরে আসেন। ১৮৬২ সালের মার্চ মাস। অ্যাণ্ডারসন দারজিলিং অঞ্চলে আসেন সিনকোনা চাষের চেষ্টায়। ঘুম স্টেশন থেকে খানিক দূরে নয় হাজার ফুট উঁচু সিঞ্চল পাহাড়ে ১লা জুন তিনি দু শ চারা রোপণ করেন। এই অঞ্চলে বেশ ঠাণ্ডা, আর খুব বৃষ্টি হয়। তাই ভাবলেন এখানে সিনকোনা গাছ বাড়বে ভালো। পাঁচ মাস গেল। চারাগুলি বেশ মোটা মোটা হয়ে উঠল। তার পর ডিসেম্বর মাস যেই এল, অমনি আধমরা হয়ে যেতে লাগল। অ্যাণ্ডারসন তখন তাড়াতাড়ি লিবংয়ের অপেক্ষাকৃত গরম অঞ্চলে চারাগুলিকে নিয়ে গেলেন। পরের বছর রংবি উপত্যকায় সিনকোনার গোটা আবাদ সরিয়ে ফেললেন। রংবি উপত্যকা দারজিলিং শহর থেকে বারো মাইল দূরে, সিঞ্চল পাহাড়ের দক্ষিণ পূর্বদিকে, ৪,৫০০ ফুট উঁচু জায়গায়। নীলগিরি থেকে অনেক চারা এনে রোপণ করা হল।

তখন দারজিলিং অঞ্চলে রেলপথ হয় নি। তখনকার দিনে সেখানে শীত যেমন প্রচণ্ড বৃষ্টিও তেমনি প্রচুর ছিল। অ্যাণ্ডারসনকে খুবই ভুগতে হল। ঘনবন কেটে আবাদের জায়গা গড়তে হ'ল। যেখানে তিন মাসের মধ্যে চাষ করতে পারবেন ভাবলেন, সেখানে লাগল দু বছর সময়। দারজিলিংয়ের অধিবাসীরা তখন ফুলের টব কাকে বলে জানত না। টব আনতে হত কলকাতা থেকে। ভালো জাতের বালি পর্যন্ত পাওয়া যেত না। এক মণ বালি এল শিবপুর বাগান থেকে। তখন কলকাতা থেকে মালপত্র আসতে দেড় মাসের বেশি সময় লাগত। যাই হোক, ধীরে ধীরে কাজ অগ্রসর হতে লাগল। ১৮৬৪ সালে রংবি উপত্যকার বিভিন্ন উচ্চতায় সিনকোনার আবাদ শুরু হল। লিবংয়ের অঞ্চলে চাষ বন্ধ হল। ক্রমে ক্রমে তিস্তার উপত্যকায় আবাদের কাজ এগিয়ে চলল। ১৮৬২ সাল থেকে ১৮৭৪ সাল, প্রথম তের বছর কেবল খরচই হল। এই তের বছরে সিনকোনার চারা বেচে আয় হল মাত্র ৭,৯৫৮ টাকা, অথচ সেখানে ব্যয় হল ৬৪৬,২৪৩ টাকা।

প্রথম তের বছরের আয়-ব্যয়

সাল	আয়	ব্যয়
১৮৬২		৯,৪৫৫
১৮৬৩		১০,৪২১
১৮৬৪		৩৯,০৯৬
১৮৬৫		৫৯,০৬৩
১৮৬৬		৪৮,৯৬৪
১৮৬৭	১,০৬৮	৬৭,৬০১
১৮৬৮	৫৪৩	৭৫,৯৬৫
১৮৬৯	১৫৬	৫৪,৫৪২
১৮৭০		৫৪,৫৭৬
১৮৭১	১,৪৮৪	৬০,০২৩
১৮৭২	২,৩২০	৫০,৭৯৫
১৮৭৩	২,৩৮৭	৫৫,৬২০
১৮৭৪		৫৯,৯৪২
মোট টাকা	৭,৯৫৮	৬৪৬,২৪৩

১৮৮৬ সালে রংবির আবাদে ছয় হাজার সিনকোনার চারা রোপণ করা হল। আর ১,৭৯,০০০ চারা রোপণ করবার জন্য তৈরি রইল। নীলগিরিতে সিনকোনার চাষ তখন আরও অনেক অগ্রসর হয়ে গেল। সেখানে প্রায় ৪০,০০০ গাছ রোপণ করা হয়ে গেল। আর দেড় লক্ষ চারা তৈরি রইল।

আমাদের দেশে যেসব জায়গায় সিনকোনা-চাষের চেষ্টা হয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া গেল। এর মধ্যে মাদ্রাজ ও বাংলায় আজও সিনকোনার আবাদ হয়, অন্যত্র বন্ধ হয়ে গেছে।—

বাংলায়	বোম্বাইয়ে
মংপু	মহাবালেশ্বর

মাদ্রাজ অঞ্চলে	আসামে
উইনাড জেলা	খাসিয়া পাহাড়
দক্ষিণ কানাড়া	দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে
গঞ্জাম	সাহারানপুর
কুর্গ	দেরাদুন
নালামালি পার্বত্য প্রদেশ	মুসৌরি
ত্রিবাঙ্কুর	গাড়ওয়াল
পালনি পার্বত্য প্রদেশ	কুমায়ুন
টিন্নাভেলি পার্বত্য প্রদেশ	রানিক্ষেত
শেভারয় পার্বত্য প্রদেশ	আরকালি
নীলগিরি পার্বত্য প্রদেশ	কাংড়া উপত্যকা

১৮৮৮ সালে সবপ্রথম কুইনিন নিষ্কাশনের ব্যবস্থা হল। সে বছর তিন শ পাউণ্ড তৈরি হল। ১৮৯৮ সালে রংবির আবাদ মংপু পর্যন্ত বিস্তৃত হল।

কুইনিনের পরিমাণ ও আয়

সাল	পরিমাণ (পাউণ্ডে)	আয় (টাকায়)
১৯৩৬	২০,৮৩৯	৬৫২,৭২৩
১৯৩৭	১৪,০১৯	৮৩১,৮১৮
১৯৩৮	১৬,৫২৫	৯৪১,৬১৬
১৯৩৯	১৭,০২৫	৮৯৫,০২০
১৯৪০	১৮,৯২২	১,৩৯১,৯৪৫

আমাদের দেশে *C. Ledgeriana*-র গাছ করা শক্ত। তা ছাড়া কেবল কুইনিন নয়, অন্যান্য উপক্ষারগুলির, সিনকোনিডিন, কুইনিডিন আর সিনকোনিনের চাহিদাও আছে। মংপুতে *C. Ledgeriana*-র চাষ বেশী করা হয়। যেসব অঞ্চলে *C. Ledgeriana* ভালো জন্মায় না,

সেখানে *Ledgeriana* × *succirubra* বর্ণসংকর গাছের চাষ করা হয়। এই জাতির গাছে অবশ্য কুইনিনের পরিমাণ কম। তবে গাছ খুব জোরালো হয়। গাছের অত যত্নও করতে হয় না। আর-এক জাতীয় বর্ণসংকর গাছও জন্মানো হয়, *officinalis* × *succirubra* ; এর অন্য নাম *C. robusta* Howard। বিভিন্ন তাপে ও উচ্চতায় সহজে জন্মায় বলে এ গাছের চাহিদা আছে। *C. succirubra*-রও চাষ করা হয়।

আজকাল মংপুর আবাদে বার্ষিক আয় বেশ লাভজনক। জাভা ও আমাদের দেশে সিনকোনার চাষ প্রায় এক সময়ে শুরু হয়। জাভা করেছে কত বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আর আমাদের দেশ নিয়েছে তার কষ্টলব্ধ ফলটুকু। জাভায় আবাদ হয়েছে বিস্তৃত ও উন্নত। সেখানে সিনকোনা সম্বন্ধে বিস্তৃত গবেষণা বৃদ্ধি পেয়েছে। আর আমাদের দেশ তার অনুকরণ করে ক্ষান্ত হয়েছে। জাভায় সারা পৃথিবীর চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ কুইনিন তৈরি হয়; আর আমাদের দেশে মাত্র চার ভাগ। কেবলমাত্র মংপুর আবাদে আরও কম। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া সারাতে যে পরিমাণ কুইনিন দরকার হয় তার তিন ভাগের মাত্র একভাগ আমাদের দেশে তৈরি হয়। জাভার মুখ চেয়ে থাকতে হয় আমাদের আজও।

আর যেসব জায়গায় সিনকোনার চাষ হয়

যুক্তরাষ্ট্র	ইকুএডর
মেক্সিকো	পেরু
ব্রাজিল	ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ
জামায়েকা	ক্যালিফোর্নিয়া
ট্রিনিডাড	হাওয়াই
মার্টিনিক	ফিজি
মাডাগাস্কার	জাপান
বেলজিয়ান কঙ্গো	মালয়

টাঙ্গানায়িকা	কোচিন চীন
বার্লিন	সাওটোমে
আন্নাম	রিইউনিয়ন
বলিভিয়া	অস্ট্রেলিয়া
কলম্বিয়া	নিউ ক্যালিডোনিয়া
কস্টারিকা	প্যারিস

সিনকোনার ব্যবসা

বনজ সম্পদ হিসাবে দক্ষিণআমেরিকার অ্যাণ্ডিক পর্বতমালার জঙ্গল থেকে সিনকোনার ছাল সংগ্রহ করা হয়। তার পর জাভার সিনকোনার বাগান থেকে তো প্রচুর পরিমাণে ছাল উৎপন্ন হয়ই। বাংলাদেশেও সামান্য পরিমাণে হয়। সম্প্রতি দক্ষিণআমেরিকায় ও গুয়াটেমালায় সিনকোনার চাষ শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত জাভা আর ভারতবর্ষ থেকে সিনকোনার ছাল আমেরিকায় রপ্তানি হত। আর চালান যেত দক্ষিণ-আমেরিকার বনজ সিনকোনা থেকে। যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের বোর্ড অব ইকনমিক ওআরফেয়ার (Board of Economic Warfare) দক্ষিণ-আমেরিকায় উদ্ভিদতত্ত্ববিদ পাঠান সিনকোনার ছাল আর কোন্ কোন্ জায়গা থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে আবিষ্কার করবার জন্য। এইসব উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা কলম্বিয়া আর ইকুএডরে বহুস্থানে *C. pitayensis* Weddel জন্মেছে দেখতে পান। এই গাছের ছালে শতকরা তিনভাগ কুইনিন পাওয়া গেল। তখন থেকে কুইনিন নিষ্কাশনের জন্য এই গাছের ছাল সংগ্রহ করা আরম্ভ হল। যুদ্ধের ঠিক পরে ১৯৪৫ সালে ৭,৩১৭,৯৯৯ পাউণ্ড সিনকোনা ও কুইনিন রপ্তানি হয়েছে আমেরিকায়, কলম্বিয়া, ইকুএডর, পেরু, বলিভিয়া আর গুয়াটেমালা থেকে। ১৯৪৭ সালে কিছু পরিমাণে গেছে বৃটিশ মালয় থেকে।

বিভিন্ন জাতির সিনকোনা ছাড়া আর-এক গাছের ছালে ৩% কুইনিন

পাওয়া গেছে। এটির নাম রেমিজিআ পেডাঙ্কুলাটা (*Remijia pedunculata* Fluckiger), এর বাসস্থান উত্তর-কলম্বিয়ায়। এর থেকেও আজকাল কুইনিন নিষ্কাশন হচ্ছে।

C. calisaya

*C. calisaya*র কোষের ছবি

*C. calisaya*র ছালের ভিতরকার কোষের ছবি অণুবীক্ষণে যেমন দেখা যায়। CK কর্ক, অনেকগুলি চারকোণা কোষ দেখা যাচ্ছে। C কর্টেক্স, st ষ্টার্চ, m ষ্টার্চের ছোট ছোট কেলাস; ld ল্যাটিসিফেরস ডাক্টস্; p ফ্লোএম; m.r. মেডুলারি রেজ; b.a. ব্যাষ্ট ফাইবার্স; s সীভ টিস্যু।

সিনকোনার উপাদান

গাছের দশ বছর বয়স হলে তবে সেই গাছ থেকে ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। ছাল সংগ্রহ করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল গাছ উপড়ে ফেলে মূল থেকে শুরু করে কচি ডালের ছাল পর্যন্ত ছাড়িয়ে নেওয়া। এতে খরচও সবচেয়ে কম পড়ে। তার পর কাঁচা ছাল শুকিয়ে নেওয়া হয়। শুকালে ছালের ভিতর দিকটার রং লালচে ব্রাউন হয়।

সিনকোনার ছালে অন্তত শতকরা ছয়ভাগ উপক্ষার না থাকলে, সে ছালকে ভালো জাতের ছাল বলা হয় না। এই ছয় ভাগের আবার অধিক পরিমাণে কুইনিন আর সিনকোনিডিন উপক্ষার থাকা চাই। বিভিন্ন জাতির সিনকোনার বিবিধ উপক্ষারের পরিমাণের তালিকা দেওয়া হল।—
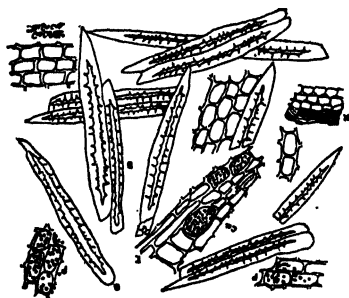
সিনকোনার ছাল চূর্ণ, অণুবীক্ষণে যেমন দেখা যায়। B ব্যাস্ট ফাইবার্স; Ca ছোট ছোট কেলাস; P প্যারেঙ্কিমেটম্ কোষ; E সীড টিস্যু; K কর্ক।

সিনকোনার উপক্ষারের শতকরা পরিমাণ

সিনকোনার জাতি	উপক্ষারের পরিমাণ	কুইনিন	সিনকোনিডিন	কুইনিডিন	সিনকোনিন
C. Ledgeriana	৫ – ১৪	৩ – ১৩	০ – ২.৫	০ – ·৫	০ – ১·৫
C. calisaya	৩ – ৭	০ – ৪	০ – ২	০ – ৩	·৩ – ২
C. succirubra	৪.৫ – ৮.৫	১ – ৩	১ – ৫	০ – ·৩	১ – ২·৫
C. officinalis	৫ – ৮	২ – ৭·৫	০ – ৩	০ – ·৩	০ – ৩
C. Ledgeriana × *C. succirubra*	৬ – ১২	৩ – ৯	০ – ৩	০	·৫ – ১·৫
C. officinalis × *C. succirubra* (*C. robusta*)	৬ – ৮·৫	১ – ৮	২·৫ – ৬·৫	যৎসামান্য	০ – ১

সিনকোনার ছালের সবচেয়ে দরকারী উপাদান হল কুইনিন, কুইনিডিন, সিনকোনিডিন আর সিনকোনিন উপক্ষার।

এদেশজাত সিনকোনার কুইনিনের শতকরা পরিমাণ

সিনকোনার জাতি	আবাদের জায়গা	কুইনিন
*C. succirubra*র গাছে		
*C. Ledgeriana*র কলম	জাভা	৫'৫ – ৮
C. Ledgeriana	বাংলা	৫'৫
C. succirubra	বাংলা	১'৪
C. officinalis	জাভা	২'৯

সিনকোনার ছাল থেকে কুইনিন তৈরি করতে হলে প্রথমে ছাল শুকিয়ে খুব ভালো করে চূর্ণ করতে হয়। তার পর তাতে কলিচুন আর জল মিশিয়ে মণ্ড তৈরি করে আবার শুকিয়ে চূর্ণ করে নেওয়া হয়। এই চূর্ণটি বারবার পেট্রোলিঅম দিয়ে গরম করলে উপক্ষারগুলি পেট্রোলিঅমে দ্রবিত হয়ে ছালে চূর্ণ আর চুনের গুঁড়া থেকে পৃথক হয়ে আশে উপক্ষার দ্রবিত পেট্রোলিঅমে তখন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জল দিয়ে ঘাঁটা হয়। তাতে এবার উপক্ষারগুলি পেট্রোলিঅম থেকে অ্যাসিডে দ্রবিত হয়ে পড়ে। পরে অ্যাসিড দ্রবণে সাবধানে সোডা গুলে দেওয়া হয়। তখন কুইনিন ও অন্যান্য উপক্ষারগুলি পৃথক হয়ে আসে।
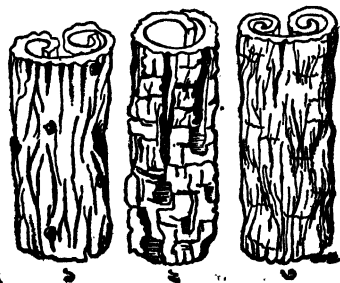
সিনকোনার ছাল

১. লাল সিনকোনা বা *C. succirubra*-র ছাল। আঁচিলের মত ঘুঁটি ও ফাটল দেখানো হয়েছে।

২. *C. calisaya*-র ছাল। পাতা ছিঁড়ে নেওয়ার দাগ আর ফাটল দেখানো হয়েছে।

৩. *C. succirubra*-র ছাল। ছালের উঁচু নীচু ভাব ও ফাটল দেখানো হয়েছে।

জ্বরঘ্ন সিনকোনা

কুইনিন ছাড়া অন্যান্য উপক্ষারগুলিও ম্যালেরিয়া জ্বর বন্ধ করে। তাই সিনকোনার সব উপক্ষারগুলিই জ্বরঘ্ন বলে চিকিৎসাশাস্ত্রে স্থান পেয়েছে। আমাদের দেশে সস্তায় ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় 'টোটাকিনা' চূর্ণ। টোটাকিনা হল সিনকোনার ছাল থেকে সংগ্রহ করা সব উপক্ষারের মিশ্রণ। তবে একটা কথা আছে। এই চূর্ণতে শতকরা অন্তত সত্তর ভাগ কুইনিন, কুইনিডিন, সিনকোনিন আর সিনকোনিডিন উপক্ষার থাকা চাই। নইলে জ্বর সারে না।

ম্যালেরিয়ার অন্যান্য ওষুধ

ওষুধের দ্বারা প্লাস্‌মোডিঅম ধ্বংস করা হয়। যদি কোনো ক্রমে স্পোরোজোইট ধ্বংস করা যায় তা হলে রোগ না প্রকাশ পেতেই রোগের কারণ নির্মূল হয়। দ্বিতীয়ত প্লাস্‌মোডিঅমের বংশবৃদ্ধি বন্ধ করে ম্যালেরিয়া-জ্বর সারানো যায়। ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধের অবশ্যই এইসব গুণ থাকা দরকার।

ম্যালেরিয়ানাশক হিসাবে কুইনিন উপক্ষার যথার্থই বিখ্যাত। কুইনিন উপক্ষারের অণুর কাঠামো সম্বন্ধে সঠিক ধারণা বিজ্ঞানীরা করেছেন, এমন কি পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত করেছেন। শুধু তাই নয়, কুইনিনের কাঠামো বজায় রেখে বিবিধ রাসায়নিক সংশ্লেষ করেছেন, এবং তাদের ম্যালেরিয়া-নাশক গুণ আছে বলে প্রমাণ করেছেন।

একটি চীন দেশীয় গাছ থেকে ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধ পাওয়া যায় বলে সম্প্রতি জানা গেছে। এটির উদ্ভিদতত্ত্বগত নাম ডাইক্রোআ ফেব্রিফিউগা (*Dichroa febrifuga* Lour)। এটি দারজিলিং অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। দারজিলিং থেকে এই গাছ নিয়ে গিয়ে আমেরিকায় পরীক্ষা করা হয়েছে। এর থেকে যে উপক্ষার পাওয়া গেছে তার নাম দেওয়া হয়েছে ফেব্রিফিউগিন। শোনা যাচ্ছে কুইনিনের চাইতেও এটি চল্লিশ গুণ বেশি ফলপ্রদ।

১৮৯১ সালে এরলিশ (Ehrlich) বলেন যে, মেথিলিন ব্লু নামক রঞ্জন-দ্রব্যের ম্যালেরিয়ানাশক গুণ আছে। অনেক দিন ধরে মেথিলিন ব্লু আর

তার সঙ্গে কুইনিন ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহার হয়েছে। ১৯১৪ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মধ্যইউরোপে কুইনিন পাওয়া শক্ত হয়ে উঠেছিল। তখন জার্মান রসায়নিকেরা ম্যালেরিয়ানাশক কোনো ভালো ওষুধ পরীক্ষাগারে সংশ্লেষিত করা যায় কিনা তাঁর চেষ্টা করেছিলেন। এরলিশ ও তাঁর সহকর্মীরা কুড়ি বছর ধরে এগার শ যৌগিক পদার্থ তৈরি করে তাদের ম্যালেরিয়ানাশক গুণ আছে কি না পরীক্ষা করেছিলেন। ১৯২০ সালে ফুর্নো প্রায় হাজার খানেক যৌগিক পদার্থের অনুরূপ পরীক্ষা করলেন। চিকিৎসক, রসায়নবিদ জীববিদ্যায় পারদর্শী লোকেরা দল বেঁধে ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধ উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। প্রায় ছয় হাজার যৌগিক পদার্থ তৈরি করা হয়, আর তাদের ম্যালেরিয়ানাশক গুণ পরীক্ষা করা হয়।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ উদ্ভাবন করতে প্রথমে রসায়নবিদেরা কুইনিন কিম্বা সিনকোনিনের কাঠামোযুক্ত যৌগিক পদার্থ তৈরি করে তার ম্যালেরিয়ানাশক গুণ পরীক্ষা করতে লাগলেন। এমনকি গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ও এই দিকে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। কিন্তু কুইনিনের সমকক্ষ কোনো যৌগিক পদার্থ আজও সংশ্লেষিত হয় ওঠে নি।

কুইনিন কাঠামোর কতটুকু অংশ একটি যৌগিক পদার্থে বর্তমান থাকলে তবে ম্যালেরিয়ানাশক গুণ অর্শায় তার পরীক্ষা করা হল। সেইটুকু অংশ বজায় রেখে বিবিধ যৌগিক পদার্থ গড়ে তোলা হল। সেদিক থেকেও বিগত মহাযুদ্ধে এবং তার পূর্বেও অনেক কাজ হয়েছে। ১৯১১ থেকে ১৯৪৫ সাল নাগাত প্রায় তিন হাজার যৌগিক পদার্থ তৈরি করে, তার ম্যালেরিয়া-নাশক গুণ পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে চিকিৎসকেরা কুইনিনের পরিবর্তে কিংবা কুইনিনের সঙ্গে আর চারিটি ওষুধ ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছেন। পামাকুইন, পেন্টাকুইন, আইসোপেন্টাকুইন ও প্রাইমাকুইন, এই চারিটির যে-কোনো একটি ম্যালেরিয়ার ভালো ওষুধ বলে বিবেচিত হয়েছে।

ক্লোরিনযুক্ত হলে অনেক ক্ষেত্রে যৌগিক পদার্থে জীবাণু-নাশক গুণ জন্মায়। তাই ক্লোরোকুইন ও ক্যামোকুইন বলে দুইটি ক্লোরিনঘটিত ম্যালেরিয়ার ওষুধ তৈরি করা হয়েছে।

১৯১৩ সালে অ্যাক্রিফ্লাভিন বলে একটি ভালো জীবাণুনাশক ওষুধ আবিষ্কৃত হয়। তার অণুর কাঠামোকে বলে অ্যাক্রিডিন কাঠামো। এই কাঠামোযুক্ত কতকগুলি পদার্থ সংশোধিত করে তার মধ্যে কুইন্যাক্রিন পদার্থটি ম্যালেরিয়ায় প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। এটির জার্মান নাম অ্যাটাব্রিন, বৃটিশ নাম মেপাক্রিন, রুশ নাম অ্যাক্রিকিন, আর আমেরিকান নাম হল কুইন্যাক্রিন। এটি ম্যালেরিয়ার খুব ভালো ওষুধ বলে আজও ব্যবহার করা হয়।

১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডে আবিষ্কৃত হল প্যালুড্রিন। কুইনিনের কাঠামো বা ইতিপূর্বে জানা পামাকুইন কিংবা অ্যাটাব্রিনের কাঠামোর সঙ্গে পালুড্রিনের কাঠামোর কোনো সাদৃশ্য নেই। এখন বাজারে প্যালুড্রিন সহজে পাওয়া যাচ্ছে, তাই তা ব্যবহার করাও চলেছে।

সালফাডাইআজিন নামে বিখ্যাত ওষুধটিও অনেক অংশে ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা চলে। আর-একটি ম্যালেরিয়ার ওষুধ উদ্ভাবিত হয়েছে আমেরিকায় ১৯৪৮ সালে। ম্যালেরিয়ানাশক গুণ হিসাবে এটির বৈচিত্র্য আছে। কুইনিন থেকে শুরু করে যতগুলি ম্যালেরিয়ার ওষুধের উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলিই নাইট্রোজেন-ঘটিত পদার্থ। অথচ এই নবোদ্ভাবিত পদার্থে নাইট্রোজেন নেই। এমনকি এতে ক্লোরিন বা সালফার জাতীয় জীবাণুনাশক উপাদানও নেই। এর নাম ল্যাপিনোন। এটি অকস্মাৎ উদ্ভাবন করেন ফিজার (Fieser)। ইনি ১৯৫১ সালে জানুয়ারি মাসে কলকাতায় আসেন, ও ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশুন অব্ সায়ান্স (Indian Association for the Cultivation of Science) প্রতিষ্ঠানে তাঁর উদ্ভাবিত ম্যালেরিয়ানাশক ওষুধের গুণাগুণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

ম্যালেরিয়া-নাশক ওষুধের অনুসন্ধান আজও চলেছে। কুইনিনের চেয়ে ফলপ্রদ অথচ তিক্ত নয় এমন একটি ওষুধ সম্প্রতি সংশ্লেষিত হয়েছে, এর নাম ডারাপ্রিম (Daraprim)।

পরিশিষ্ট

ম্যালেরিয়ার ওষুধের অণুর গঠন

কুইনোলিন কাঠামো

কুইনিন

ফেব্রিফিউগিন

পামাকুইন

পেন্টাকুইন

CH_3O

N

$NH(CH_2)_5NHCH(CH_3)_2$

আইসো পেন্টাকুইন

CH_3O

N

$NHCH(CH_2)_3NHCH(CH_3)_2$

CH_3

প্রাইমাকুইন

CH_3O

N

$NHCH_3(CH_2)_3NH_2$

ক্লোরোকুইন

$CH_3CH(CH_2)_3N(C_2H_5)_2$

NH

Cl

N

ক্যামোকুইন

NH — OH

$CH_2N(C_2H_5)_2$

Cl N

অ্যাক্রিডিন কাঠামো

N

অ্যাক্রিফ্লাভিন

H_2N NH_2

+N

H_3C Cl^-

কুইনাক্রিন

$CH_3CH(CH_2)_3N(C_2H_5)_2$

NH

OCH_3

Cl N

প্যালুড্রিন

NH NH

$NH-C-NH-C-NH-CH(CH_3)_2$

Cl

সালফাডাইআজিন

N

$-NHO_2S-$ NH_2

N

ল্যাপিনোন

O

$CH_2(CH_2)_3CH_3$

$CH_2(CH_2)_7-C-OH$

$CH_2(CH_2)_3CH_3$

OH

O

মেথিলিন ব্লু

S^+

$(CH_3)_2N$ $N(CH_3)_2$

N Cl^-

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা